দুইবার রাজা
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

BENGALIEBOOK.COM
BE
★2022★

# দুইবার রাজা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বাজে-পোড়া ঠুঁটো তালগাছটা উঠোনের পাশে দাঁড়িয়ে, যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আকাশকে ঠাট্টা করছে। অথচ ম্রিয়মাণ, বিষণ্ন।

বুকের মধ্যে যেন একটা হাপর আছে, উঁচু তাকিয়াটায় ঘাড় গুঁজে উবু হয়ে শুয়ে অমর হাঁপানির টান টানছে। ডাক্তার খানিকটা ন্যাকড়ায় কি একটা ঝাঁঝালো ওষুধ ঢেলে দিয়ে বলে গিয়েছিল শুকতো তাতে টান কমা দুরে থাক, রগ দুটো বাগ না মেনে একসঙ্গে টনটন করে উঠেছে। বন্ধু সরোজ কতগুলি দড়ি পাকিয়ে মাথার চারপাশটা সজোরে বেঁধে দিয়ে গিয়েছিল। এখন ভীষণ লাগছে তাতে কিন্তু দড়িগুলি খুলে ফেলতে পর্যন্ত জোরে কুলোয় না।

বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জাগাতে ইচ্ছে করছে না— পরিক্লান্ত ঘুমন্ত করুণ মুখোনি।

প্যাঁকাটির মতো লিকলিকে দেহ,—একটা টিকটিকি যেন। এই একটুখানি টিকে থাকার বিরুদ্ধে সমস্তটা দেহ ষড়যন্ত্র করছে। তার কী আর্তনাদ! যেন একটা ভূমিকম্প বা বন্যা!

মার বিষাদস্নিগ্ধ মুখোনির পানে চেয়ে অমরের মনে পড়ল, হঠাৎ কবে কার মুখে গান শুনেছিল —'জানি গো দিন যাবে, এদিন যাবে' শেলিও এ কথা বিশ্বাস করে সমুদ্রে ডুব দিয়েছিল— তারপর একশ বছর এক এক করে খসেছে। দিন আর এল না। বসন্ত যদি এলই,—মহামারী নিয়ে এল, নিয়ে এল চৈত্রের চোখ ভরে রৌদ্রের রোদন।

'আজি হতে শতবর্ষ পরে'—। সেদিনো পল্লবমর্মরে কোটি কোটি ক্রন্দন অনুরণিত হবে প্লেটোও তো কত আগে স্বপ্ন দেখেছিল, বার্নার্ড শ'ও দেখেছে। সে কবে গো কবে?

অমরের হঠাৎ ইচ্ছে করল একটা কবিতা লিখতে—সমস্ত বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করে। ভুয়ো ভগবান আর ভুয়ো ভালবাসা। যেমন ভুয়ো ভূত।–মনে পড়ে বায়রন, মনে পড়ে শোপেনহাওয়ার।

যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে অমর বেরিয়ে এল উঠোনে। সেই ঠুঁটো তালগাছটার গুঁড়ি ধরে হাঁপাতে লাগল। দুজনে যেন মিতা একসঙ্গে আকাশের তারাকে মুখ ভেঙচে ভয় দেখাচ্ছে।

সমস্ত আকাশে কিন্তু নিস্তরঙ্গ ঔদাসীন্য।

ঝড়ের পর যেমন অরণ্য—টানটা পড়েছে।

মা বললেন—নাই বা গেলি কলেজে আজ। একটা ছাতাও তো নেই যে রোদ—

অমর বললে—হাজিরা থাকবে না। তা ছাড়া মাইনে না দেওয়ার দরুন কি দাঁড়িয়েছে অবস্থাটা দেখে আসি।

—অবস্থা আর এর বেশি কি সঙ্গীন হবে? দুমাসের মাইনে দেবার শেষ তারিখ উতরে গেছে দেখে নাম লাল কালিতে কেটে দিয়েছে।

সরোজ বললে—তুমি ফ্রি না?

দু হাত দিয়ে বুকের ঘাম মুছে অমর বললে—তা হলে সুপারিশ লাগে,—ঐ যে মোড়ের তেতলা বাড়ির বারান্দায় বসে যিনি মোটা চুরুট টানেন তাঁর। তিনি আর প্রিন্সিপ্যাল তো আমার মার এই ঘেঁড়া কাপড়, বন্ধক দেওয়া দু-খানি সোনার বালা, এই ঝুল-ঝোলা নোংরা দাঁত-বের করা খোলার ঘরটা দেখতে আসেন নি আরজি একটা করেছিলাম বটে, সুপারিশ ছিল না বলে বাতিল হয়ে গেল সোজা হয়ে আজো যেন দারিদ্র্য তার সত্য পরিচয় দিতে শেখে নি আর মহীনকে চেন তো? বাইকে যে আসে—ফ্রি। বাড়ি থেকে মাইনে বাবদ যা টাকা আসে, তা দিয়ে। ‘পিকাডিলি’ টিন কেনে, সেলুনে বসে দাড়ি কামায়।

মা হতাশ হয়ে বললে—উপায় কি হবে তবে?

যেন হঠাৎ একটা বাড়ির ভিত খসে গেল কাদায় বসে গেল চলন্ত গাড়ির চাকা!

অমর বললে—ভিজিট পাবে না জেনে ডাক্তার যখন ন্যাকড়ায় ভোঁটকা-গন্ধওলা খানিকটা নাইট্রিক অ্যাসিডের মতো কি ফেলে বলে গিয়েছিল ও রোগে কেউ মরে না, তখন আশ্বস্ত হয়ে আমাকে তোমার বুকে নিয়ে কি বলেছিলে? বলেছিলে—ঠাকুর তোকে বাঁচিয়ে রাখুন, এইটুকুই শুধু চাই। বেশ তো, আবার কি! কাল যদি ফের টান ওঠে, তোমার এ ভূতুড়ে হাতুড়ে ডাক্তার না ডাকলেও বেঁচে উঠব।

পরে ঢোঁক গিলে ফের বললে তোমার সেই ঠাকুর উড়ে ঠাকুরদের মতোই বাজে রাঁধুনে, মা। হয় খালি ঝাল, নয় খালি নুন পরিবেশন করতে পর্যন্ত ভালো শেখে নি।

জামাটা খুলে ফেললে। ছাব্বিশ ইঞ্চি বুক, কঞ্চির মতো হাত-পা, পিঠটা কুঁজো, মাথার চুলে চিরুনি পড়ে না,—তবু মনে হয় যেন একটা উদ্ধত তর্জনী।

মা পাখা করে ঘামটা মেরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। যেমন করে পুরুত তার নারায়ণ-শিলা গঙ্গাজলে ধোয়—ততখানি যত্নে।

সরোজ বললে—তা কি হয়? সামান্য কটা টাকার জন্য কেরিয়ার মাটি করার কোন মানে নেই। আমি দেব টাকা, মাইনে দিয়ে দিয়ে ফাইনসুষ্ঠু।

মার বুকের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে অমর বললে—কিছু লাভ নেই তাতো তা ছাড়া পার্সেন্টেজও নেই। হপ্তায় দু বার করে টান ওঠো বানান ভুল নিয়ে ঘোষমাস্টারের সঙ্গে তর্ক করা অবধি প্রক্সিও চলে না আর, খালি আমাকে জব্দ করার চেষ্টা। 'গোস্ট'কে যদি অনবরত ঘোস্ট' বলে চলে একঘণ্টা ধরে,—তা আর যার সহ্য হোক, আমার হয় না, ভাই। বিনয় সহকারে প্রতিবাদ করলাম, মাস্টার তো রেগেই লাল। প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে নালিশ—আমি নাকি অপমান করেছি। আমি বললাম—'উনি 'গোস্ট'কে বলেন 'ঘোস্ট', 'পিয়ার্স'কে বলেন 'পায়ার্স'—তাই শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম ও উচ্চারণগুলি কি ঠিক?

সরোজ বললে—প্রিন্সিপ্যাল কি বললেন?

—বললেন, প্রোফেসার তোমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন। তাঁকে করেক্ট করবার তোমার রাইট নেই। ফের এমন বেয়াদবি কর তো ফাইন করবা অদ্ভুত! তা ছাড়া, আমি বিরক্ত হয়ে গেছি, সরোজ।

একটু থেমে বললে—আমি কী বিরক্ত হয়ে যে গেছি, তুমি তা ভাবতেও পারবে না। আমাদের। যিনি পয়েট্রি পড়ান, তিনি আবার উকিল। চাপকান পরে ছুটতে ছুটতে হাজির, এক গাদা পানে মুখটা ঠাসা—কীটসের 'নাইটিঙ্গল' পড়াবেনা ডাক্তার যেমন ছুরি দিয়ে

মড়া কাটে ভাই, তেমনি করে কবিতাটা দলে পিষে দুমড়ে চটকে একেবারে কাদাচিংড়ি করে ছাড়লেন। ওঁর ব্যাখ্যা শুনে এত ব্যথা লাগল যে, মনে হল বেচারা কীটস যদি ছাত্র হয়ে শুনত ওঁর পড়া, তো বেঞ্চিতে কপাল ঠুকে ঠুকে আত্মহত্যা করত। কী সে চেঁচানি, পানের ছিবড়ে ছিটকে পড়ছে,—ভয়ে নাইটিঙ্গেলের প্রাণ থ হয়ে গেছে। 'রুথ'-এর কথা যেখানে আছে, সেখানটায় এসে ওঁর কী বিপুল হাত ছোঁড়া— ও জায়গাটা মুখস্থ করে এসেছিল নিশ্চয়ই। 'রুথ'-এর গল্প কি, বাইবেলের সঙ্গে কোথায় তার অমিল এই নিয়ে তুমুল তর্ক, তুমুল আস্ফালন। 'খুব সোজা' বলে বই মুড়ে কৌটোর থেকে গোটা। চার পান মুখে পুরে প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে গেলেন আলপাকার পাল তুলে। বোধ হয় অনেক দিন বাদে একটা মোকদ্দমা পেয়েছিলেন। তখনো ভালো ছাত্রেরা বইয়ের ধারে মাস্টারের শব্দার্থ টুকে রাখছে ও পরস্পরে রুথের শ্বশুরবাড়ি নিয়ে পরামর্শ করছে। ভাই সরোজ, আর জ্যোৎস্নারাতে কীটস পড়া চলবে না কোনোদিন।

পরে মাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে—তুমি ভাবছ মা যে তোমার ছেলে বি.এ. পাশ করতে পারল না বলেই বয়ে গেল?নয় মা নয়। জান? —যারা খুব বড় হয়েছে তাদের শব্দের অর্থ জানতে মার গয়না বন্ধক দিয়ে কলেজে পড়তে আসতে হয় নি এ দিন যাবে, এ কথা তো তুমিই বেশি বিশ্বাস করা দিন যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু যদি তার পর কালো ঝড়ো রাত্রিই আসে, তাতেও ভড়কাবার কিছু নেই। আমাকে জন্ম থেকে এমন পঙ্গু পক্ষাহত করে বানিয়েছেন বলে জবাবদিহি দিতে হবে বিধাতাকেই।

মা মিছরির জল ঘেঁকে দুই কাঁচের গ্লাসে করে দুই বন্ধুকে ভাগ করে দিলেন বললেন—আর একটা গয়নাও তো নেই—

—খবরদার, মা। আমার কলেজে পড়া এইখেনে খতমা আমি একটা ফাটা ফুসফুস নিয়েই লড়বা তুমি আমার মা, আর ঐ তালগাছটা আমার ছেলেবেলার বন্ধু কতকালের চেনা।

সরোজ জিজ্ঞেস করলে কি করবে তা হলে এখন?

—কবিতা লিখব। তুমি হেসো না, সরোজ। কথাটা ভারি বেলা শোনাচ্ছে, জানি কিন্তু আমি সত্যিই লিখব এবার। আমার সমস্ত প্রাণ চেঁচিয়ে উঠতে চাইছে।

সরোজ হেসে বললে—তা হলে আর কবিতা হবে না।

-না হোক। সোজা সত্য কথা বুক ঠুকে আমি খুলে বলে দিতে চাই। সৌন্দর্যের আবরণ দিয়ে কুৎসিত নগ্নতাকে ঢেকে রাখার জন্যেই না তোমরা ভগবান বানিয়েছ। যে কথা বায়রন, সুইনবার্ন বা হুইটম্যান পর্যন্ত ভাবতে পারে নি—

—তেমন আবার কি কথা আছে?

—দেখো। যে কথা ভেবেছিলাম খালি চ্যাটারটন।

সরোজ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সহসা পাংশু হয়ে বললে—খবরদার, অমর! ও রকম মারাত্মক ঠাট্টা কোরো না।

অমর উদাসীনের মতো বললে মারাত্মক ঠাট্টাই বটে। জান, বিধাতা যদি তোমাদের প্রকাণ্ড কবি হন তো এই পৃথিবীটা তাঁর ছন্দপতন।

কিন্তু না, সত্যি সত্যিই সে রাতে অমর কালি কলম আর কাগজ নিয়ে বসল কবিতা লিখতে মেটে মেঝের ওপর হেঁড়া মাদুর বিছিয়ে মা ঘুমিয়ে পড়েছে, ম্লান বাতির আলোয় সেই মুখোনির যেন তুলনা নেই। ঐ মার মুখোনি নিয়েই একটা কবিতা লেখা যায় হয়তো।

সলতে ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছে,–কিন্তু একটা লাইনও কলমের মুখে উঁকি মারছে না। 'বিট' এর পুলিশ খানিক আগে চেঁচিয়ে পাড় মাৎ করে জুতোর ভারী শব্দ করে চলে গেছে। আবার সেই নিঃশব্দতা,–প্রকাশ করতে না পারার ব্যথার মতোই অপরিমেয়।

অমরের মনে হল, ভাষা ভারি দুর্বল, খালি ভেঙে পড়ে। লিখতে চাইছিল—এই জীর্ণ পৃথিবী, এই দানবী সভ্যতা, সব কিছুই প্রকাণ্ড ভুল বিধাতার,—এঁচড়েপাকা ছেলের ছ্যাবলামি। এঞ্জিন ড্রাইভার যেমন ভুল পথে গাড়ি চালিয়ে হায় হায় করে ওঠে,–তেমনি

অকারণে ভুল করে খেলাচ্ছলে এই পৃথিবীটা বানিয়ে ফেলে ভগবান তারায় তারায় চীৎকার করে উঠেছেন,–অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন।

এত বড় যে ব্যবসাদার, সেও দেউলে হল বলে। কবে লালবাতি জ্বলবে—প্রলয়ের। তারই কবিতা

লেখা যায় না। খালি সলতেটা পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হলে দীপ নিবে যায়।

বিকেলের দিকে অমর সরোজের বাড়ি গেল। পাশেই বাড়ি,লাগাও টিনের ঘরে একটা গাড়ি পর্যন্ত আছে।

শ্বেতপাথরের মেঝে,—দুটো দেয়াল প্রায় বইয়ে ভরা,—ছবি খান তিন চার, শেক্সপীয়র, শেলি আর বার্নার্ড শ'র একটা চেয়ারের ওপর বই গাদা করা, মেজেতে কাত হয়ে শুয়ে সরোজ একজামিনের পড়া পড়ছে। আর ঘরের এক কোণে স্টোভ জ্বালিয়ে তার বোন চায়ের জল গরম করছে আর দাদাকে বকছে সিগারেট খায় বলে।

অমরকে ঘরে ঢুকতে দেখে মেয়েটি আরো খানিকটা জল কেটলিতে ঢেলে দিয়ে বললে–যাই বল দাদা, বোহিমিয়াটা আর যাই হোক, আমাদের বহরমপুরের মতোই খানিকটা। নইলে—

সরোজ উঠে পড়ে বললে—এস অমর, বসো। তুই লক্ষ্মী দিদি, পরোটা ভেজে দিবি আমাদের? দেখনা চট করে—

বোন চলে গেলে সরোজ তাড়াতাড়ি দরজার পরদাটা টেনে দিয়ে শুধোল—এমনিই কি এসেছ, না কোনো কাজ আছে?

অমর সোজা হয়ে বললে—আমাকে কয়েকটা টাকা দাও,-এই গোটা কুড়ি।

সরোজ হাতের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—লুসাই, লুসাই, ও লুসী!

বোন দুহাতে ময়দার ড্যালাটা নিয়ে এসে পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে বল্লে—কি হুকুম মশাইয়ের?

সরোজ বললে—চাবিটা দিয়ে দেরাজ থেকে কুড়িটে টাকা বার করে দে তো শিগগির।

ঘরে ঢুকে ময়দা চটকাতে চটকাতে লুসী বল্লে—কিসের জন্যে শুনি?

উড়োতো তুই দে খুলে। ফফড়দালালি করিস নে।

দেরাজ খুলতে খুলতে লুসী বললে—দাঁড়াও না। দিচ্ছি এবার। ঠিক মতো হিসাব দিতে না পারলে রাত্রে ঘুম থেকে উঠে কে চা করে দেয়, দেখব।

বলে চলে গেল। পর্দাটা খানিক দুলে স্থির হল। টাকা দিয়ে সরোজ বললে—যদি আবার বিপদে পড় বলতে সঙ্কোচ কোরো না —

চা খেতে খেতে অমর ভাবছিল সংসারে এ একটা কি চমৎকার ব্যাপার! উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, সচ্ছল অবস্থা, কল্যাণী বোন! নাম তার লুসী!

পেছন থেকে কে অতি কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলছিল—একটা নতুন কাগজ বেরিয়েছে, যদি নেন—

সরোজ মুখ ফিরিয়ে দেখলে—অমর। খালি পা, যে ন্যাকড়া দিয়ে কালি-পড়া লণ্ঠন মোছে তেমনি কাপড় পরনে,হাঁপানি টানে ঝরঝরে পাঁজর দুটো ঝেকে উঠেছে,কথা কইতে পারছে না।

সরোজ তক্ষুনিই কাগজটা নিয়ে দাম দিল, কথা কইল না কোনো। বরঞ্চ ভারি লজ্জা করতে লাগল ওরই।

ট্রাম চলল। চলন্ত গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে অমর পা পিছলে পড়ে যেতেই সবাই রোল করে উঠল। হাঁটুটা চেপে ধরে কিছু-না' বলে অমর কাগজের বাণ্ডিলটা নিয়ে কাশতে লাগল। পরে ভিড়ের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেল। সরোজ নেমে আর খোঁজ পেলে না তার।

ফুসফুসটা যেন কে চুষে শুষে ফেলেছে।

অমর একটা গাছতলায় দুটো হাত মাটিতে চেপে টান হয়ে বসে আকাশের বাতাস নেবার জন্যে গলাটা উঁচু করে ধরেছে। কে যেন ওর টুটিটা টিপছে, ভিজা গামছার মতো ফুসফুসটা চিপে ফেলছে।

কাগজের বান্ডিলটার ওপর মাথা রেখে শুতে যেতে দেখে—পাশাপাশি দুটো বিজ্ঞাপনা একটা এক ছাত্র পড়াবার জন্যে, আরেকটা কোন অরক্ষণীয়া পাত্রীর জন্যে পাত্র চাই—যেমন-কে-তেমন হলেই চলে—ঠিক এই কথা লেখা আছে।

টানটা যদি একটু পড়ে বিকেলের দিকে,—অমর ভাবছিল,—তবে কোথায় গিয়ে আগে আরজি পেশ করবে? টিউশানির খোঁজে, না পাত্রীর?

আগে ভাবত—একমুঠো ভাত, একখানি কুঁড়েঘর, আর একটি নারী। এখন মনে পড়ছে আরো কত কথা। হাঁপানিতে ভুগবে না, ঝড়ে কুঁড়ের চাল উড়ে যাবে না, ভাতে রোগের বীজ থাকবে না, নারীর ঠোঁটে কালকূট থাকবে না। এত! তবে—

ক্লান্ত কাক ককায়, আর ককায় ও কাশে মাটির ওপর মায়ের ছেলে।

পাঁজরা দুটো খানিক জিরোলে তারপর কষ্টে পথ চলে। চলতে চলতে প্রথম ঠিকানাটাতেই ঠিক করে এল—যেখানে মাস্টার চায়।

বাড়ির কর্তা ঘাড় বাঁকিয়ে অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে শুধোলেনকদূর পড়া হয়েছে?

অমর বললে—বি.এ. পড়ছি।

–কালকে আই.এ.-র সার্টিফিকেটটা নিয়ে এসো দেখা যাবে।

একদিন খুব জোরে হাঁপানি উঠলে মা রাগ করে অমরের গলার সবগুলি মাদুলি ছিঁড়ে ফেলেছিল, আর অমর রাগ করে ছিঁড়ে ফেলেছিল—ম্যাট্রিক আর আই.এ.-র সার্টিফিকেট দুটো।

মাদুলিগুলির মধ্যে একটা সোনার ছিল বলে মা তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে বাক্সে রেখে দিয়েছিল, অমরও ভালো হয়ে এক সময়ে সার্টিফিকেট দুটোর হেঁড়া খণ্ডগুলি কুড়িয়ে রেখে দিয়েছিল একটা চৌকো লেফাফায়। আঠা দিয়ে সেই সার্টিফিকেট আজ জোড়া দিতে বসল।

কর্তা বহুক্ষণ সার্টিফিকেটটা নেড়ে নেড়ে দেখে জাল নয় প্রতিপন্ন করে বললেন—কিসে ছিড়ল?

—একটা ছোট্ট দুষ্টু বোন আছে, নাম লুসাই—দুষ্টুমি করে ছিঁড়ে ফেলেছে।

কর্তা ঘাড়টা বার চারেক দুলিয়ে বললেন—আচ্ছা বাপু, বানান কর তো থাইসিস।

পরে বললেন—বেশ বল তো ডেনমার্কের রাজধানীর নাম কি? আকবর কত সালে জন্মেছিল? এখান থেকে কি করে ডিব্রুগড় যেতে হয়?

অমর বললে—আমি তো পড়াব ইংরিজি আর অঙ্ক। আমাকে এ সব প্রশ্ন করছেন?

কর্তা খাপ্পা হয়ে বললেন—আজকালকার ছেলেগুলো দু-পাতা মুখস্থ করেই পাশ মারে। আমাদের সময় আমরা কত বেশি জানতাম।

কর্তার ছেলে পাশেই ছিল। একটা বেয়াড়া রকমের বললে—যা যা জানতে তাই বুঝি জিজ্ঞেস করছ, বাবা? মাস্টারদের যে প্রশ্নটা ভালো করে জানা থাকে, সেইটেই পরীক্ষায় দেয়, আমি বরাবর দেখছি। যেন কাগজ দেখবার সময় অসুবিধায় পড়তে না হয়।

বাপ, একটু দমে গিয়ে বললেন—আচ্ছা, একটা ইংরিজি রচনা লেখ তো, দেখি তোমার ইংরিজির কত দৌড়। একটা কাগজ-পেন্সিল নিয়ে আয় তো, টুনু।

অমর বললে—কি লিখব? ক পাতা?

কর্তা বললেন—লেখ, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি এক শ শব্দের বেশি নয়। এ রকমই আসে পরীক্ষায়।

টুনু একটু হেসে বললে বাবা, ষোলো থিয়োরেম' থেকে একটা এক্সট্রা' দাও না কষতে।

বাপ চটে বললেন—যা, ওসব কি দেব? দেব মানসাঙ্ক।

টুনু জোরে হেসে বললে—ওটা বুঝি তুমি জান না?

কর্তা রচনার কি বুঝলেন, তিনিই জানেন,—তবে দেখলেন হাতের লেখাটা বেশ পরিষ্কার। বললেন—বেশ, তবে কি জান, ইতিমধ্যে একজন বহাল হয়ে গেছে। নইলে তোমাকে নিতুম।

টুনু অস্ফুটস্বরে বললে—কিন্তু বাবা, ইনি ভালো, এঁকে আমার–

অমর শুধু বলতে পারলে—এ সব কেন লেখালেন তবে?

কর্তা বললেন—লেখা তোমাদের অভ্যেস হয়েই আছে। কালে তো জীবনের পেশাই হবে বরঞ্চ সাবেক কালের এন্ট্রান্স পাশ করা বুড়োর কাছে একটা রচনা দেখিয়ে নিয়ে তোমার লাভই হল। একটু প্র্যাকটিস হল লেখার। তা ছাড়া রচনার সাবজেক্ট'টা তো খুবই ভাল,—কি বল? জান। হে বাপু, সে-কালের এন্ট্রান্স তোমাদের এ-কালের পাঁচটা এম.এ.-র সমান,—সেটি মনে রেখো।

অমর বললে এবার—উনি কততে পড়াবেন?

—পনেরো টাকা।

—আমাকে দশটা টাকা দেবেন না হয়। দরকার হয় দু বেলা এসেই পড়াব দু ঘণ্টা করে।

টুনু বললে–হ্যাঁ বাবা, এঁকেই—

কর্তা বললেন—বেশ, আসবে কাল আর শোনো, এ ফোর্থ ক্লাসে পড়লে কি হবে, এদের। ইংরিজিটা বেশ একটু দাঁত-কামড়ানো। বাড়ি থেকে একটু পড়ে আসবে রোজা আর আমি কাল সকালবেলাই একটা রুটিন করে রাখব,কবে আর কখন কি পড়াতে হবে। বুঝলে? একটু ঝিমিয়ো কমা

রোজ শেষ রাত্রেই টানটা ঠেলে আসে। তাই নিয়েই অমর বেরিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি, পাছে আগের ঠিক করা মাস্টার চেয়ার বেদখল করে নেয়, দশ টাকা থেকে ন টাকা বারো আনায় নেমো

কেওড়া-কাঠের একটা থুথুরো তক্তপোশ,—ওপরে একটা চাটাই পর্যন্ত নেই। ফাঁকে ফাঁকে ছারপোকাদের বৈঠকখানা বসেছে।

কর্তা একটা জলচৌকি টেনে নিয়ে কাছে বসে বললেন—এই রুটিন করে দিয়েছি, দেখে নাও। ঐ চারঘণ্টা করেই রইল,সকালে দুই, বিকেলে দুই। নইলে তো সেই মাস্টারকেই রাখতাম,–দিব্যি চেহারা, দেখলেই মনে হয় ছেলে মানুষ করতে পারবো এম.এ. পাশ।

পরে বিড়বিড় করে বললেন—এখুনিই এসে পড়বে হয়তো একটা ভাঁওতা মেরে দিতে হবে।

দরজা ঠেলে যে এল,—অমর তাকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল,—মহীনা বোধ হয় বেচারা অনেকদিন আউটরাম ঘাটে গিয়ে চা খেতে পারে নি, তাই বুঝি এ চাকরিটা বাগাতে চেয়েছিল।

অমর প্রশ্ন করলে—তুই কবে এম.এ. পাশ করলি, মহীন?

মহীন সিল্কের রুমাল বার করে ঘাড়ের ঘাম মুছে বললে—তুই পাশ করিস নি নিশ্চয় পনেরো তা হলে আর জোটে নি থাইসিস' বানান পেরেছিলি তো?

বলেই বাইক করে ছুট দিলো।

কর্তা বললেন দেখলে কাণ্ডটা ভাঁড়িয়ে জোচ্চুরি করে ঠকাতে এসেছিল, ভাগ্যিস রাখিনি। পরে চৌকিটা আরো একটু কাছে টেনে বললেন—পড়াও তো বাপু শুনি।

ছেলে বললে—তুমিও আমার সঙ্গে পড়বে নাকি, বাবা?

কর্তা বললেন—দেখি না কেমন পড়ায়,—মানেগুলো সব ঠিক বলতে পারে কি না। হ্যাঁ, আরম্ভ করে দাও,–

অমর বললে—কি ভাবে আরম্ভ করব, তাও যদি বলে দেন।

কর্তা ঘাড় চুলকে বললেন—তা হলে আর তোমাকে মাস্টার রেখেছি কেন!

—কি হলে আপনার মনোমত হবে, তাও তো একান্ত জানা দরকার দেখছি। নইলে—

ছেলে রেগে বললে—আজ কিছুতেই পড়ব না বাবা, তুমি এরকম করলে। তুমি যাও চলে।

তৃতীয় পক্ষের ছেলে বাপ জলচৌকিটা নিয়ে চলে গেলেন। যাওয়া মাত্রই ছেলে উঠে দরজায় খিল এঁটে একটা বালি-কাগজের ছেঁড়া খাতা বার করে বললে—একটা কবিতা লিখেছি, মাস্টার মশাই। শুনবেন? একটা হাঁস দুই সাদা ডানা মেলে জলে ভাসছিল,কতগুলি পাজি ছেলে তাকে ধরে কেটেকুটে কাটলেট বানাচ্ছে—

সুকুমার ছেলে—দুটি কালো চোখে সুগভীর সুদূর কৌতূহল, যেন দুটি মণির প্রদীপ জ্বেলে অন্ধকারে কি অনুসন্ধান করছে।

অমর শুধু বললে—এখন ও সব থাক। এবার পড়ি এসো।

ছেলে অবাক হয় বললে—কেন বলুন তো, ‘বাবা কবিতার নাম শুনে দাঁত মুখ খিচিয়ে খড়ম নিয়ে তেড়ে আসেন, মা পড়ে পড়ে কাঁদেন,—আর আপনিও কবিতা ভালোবাসেন না? তবে আমাদের বইয়ে এত কবিতা লেখা কেন,? শুনেছি, আমাদের দেশে এক প্রকাণ্ড কবি আছেন, তিনি নাকি ছেলেবেলায় আমার মতো ইস্কুল পালাতেনা আমার ইস্কুল একটুও ভালো লাগে না,—যেন খানিকটা কুইনিন।

গায়ে খাকি রঙের শার্ট, পরনে ফিনফিনে কাপড়, কুচকুচে কালো পাড়,—খালি পা, চোখের পাতার ওপরে বড় একটা তিল।

অমর জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি, ভাই?

—কিশলয়। বড়দি রেখেছিল। বড়দিই তো আমাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছিল। ওর মরার পর আমি একটা লিখেও ছিলাম, দেখবেন সেটা? উনি দেখে গেলে কত সুখী হতেন যে, অন্ত নেই।

—তুমি কি আজ পড়বে না?

—রোজই তো পড়ি দেখুন, ছেলেবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম,—তারার বিষয়, ইংরিজিতে, আমার ভালো লাগে নি তারাকে আমার কি মনে হয়, জানেন? যেন কারা অনেকগুলি বাতি জ্বালিয়ে নীচের মানুষদের খুঁজছে, যারা বড়দির মতো কেঁদে কেঁদে মরে

গেল। আমার এক এক সময় মনে হয় ঐ বড় তারাটা যেন বড়দি। এখান থেকে একজন যায়, আর। আকাশে একটি করে বাড়ে। আমি ঐ তারাটাকে নিয়ে কতদিন একটি কবিতা লিখব ভাবছি, পারি না হয় না।

অমর অঙ্কের খাতাটা মুড়ে রেখে বললে—নিয়ে এসো তো ভাই তোমার কবিতার খাতাটি।

পুরো মাস গুজরানো হয় নি,—দিন বারো পড়ানো হয়েছে মাত্রা পয়লা তারিখ অমর হাত পাতলে মাইনের জন্য।

কর্তা বললেন—সাত তারিখের আগে হবে না।

হতে হতে সতেরো তারিখে এসে ঠেকল।

অমর অবাক হয়ে বললে–বারো দিনের মাইনে এই তিন টাকা সাড়ে তিন আনা?

কর্তা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে কেন, হিসেবের এক চুলও ভুল বার করতে পারবে না। নিয়ে এসো তো কাগজ, একটা রুল অফ থ্রি কষে ফেল। দুদিন আস নি,—তা ছাড়া এক দিন সাত মিনিট আর দুদিন সাড়ে চার মিনিট লেট করে এসেছিলে—

অমরের ইচ্ছা হল মারে ছুঁড়ে টাকা তিনটা। কিন্তু মার পরনের কাপড়টা একেবারে ছিঁড়ে গেছে —পুরোনো বইয়ের দোকানে সস্তায় একটা খুব ভালো বই দেখেছিল, যাবার সময় সেটাও কিনে নিয়ে যেতে পারে।

সকাল বেলাতেই হাঁপানি উঠেছিল সেদিন। তবুও কুঁজো হয়ে টিকোতে টিকোতে পড়াতে চলল। কিশলয় বললে—আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে?বুকে হাত বুলিয়ে দেব?

–দাও।

কতগুলি বই গাদা করে তার ওপর মাথাটা রেখে অমর শোয় আর কিশলয় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গল্প শোনে—

শেলিকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বায়রনকে দেশ থেকে। নট হামসূন ট্রাম কনডাক্টারি করত। ডস্টয়ভস্কিকে ফাঁসিকাঠে তুলে নামিয়ে দিয়েছিল,—গোর্কি থাকত উপোস করে—মুসোলিনি ভিক্ষা করত পোলের তলায় বসে—

কিশলয় উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে বুকের আরো অনেক কাছে এগিয়ে আসে।

অমর ঐ সুকোমল সুচারু বুদ্ধিদীপ্ত মুখোনির পানে চেয়ে চেয়ে অনেক কথা ভাবে, হয়তো এর মধ্যে ভবিষ্যতের ঋষি-কবি তন্ময় হয়ে আছেন।

হঠাৎ দুজনে শিউরে আঁতকে উঠল—জানালায় কার পাকানো ঝাঁঝালো দুই চক্ষু দেখে।

কর্তা বন্ধ দরজায় পা দিয়ে ধাক্কা মেরে বললেন—খোল দরজা শিগগির—

কিশলয় ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিলো।

কর্তা এক ঝাঁকানিতে অমরের হাতটা টেনে শোয়া থেকে তুলে দিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠলেন,—না পড়িয়ে শুয়ে শুয়ে উনি কবিতা শোনাচ্ছেন! গরচা পয়সা দেওয়া হয় কিসের জন্য  শুনি?নবাবজাদার মতো তক্তপোশে গা ছড়িয়ে জিরোবার জন্য, নয়? যাও বেরিয়ে এক্ষুনি—

অমর বললে—তবে বাকি মাইনেটা দিয়ে দিন।

—মাইনে দেবে না আরো কিছু! যা বাকি ছিল, সমস্ত এই বেয়াদবির জন্য ফাইন,—কিচ্ছু পাবে না, যাও চলে

দেনা টাকাটা দিয়ে নিশ্চয় আরেকবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে।

পশলা বৃষ্টির পর ঘোলা আকাশে চাঁদ উঠেছে,—মরা, মিয়নো—পথের পাঁককে ঠাট্টা করতে।

হাঁপানির টানে কাঁকড়ার মতো কুঁকড়ে অমর নিঃশ্বাসের জন্য ফুসফুসের কসরত করছিল।

চোখ বুজে খালি একটি ছবি আজ ও দেখছে—বিষণ্ণ অথচ একটি সুকোমল ছবি।

বন্ধু মৃত্যুশয্যায়। অমর দেখতে গিয়েছিল। শেফালির মতো সাদা ধবধবে বিছানা,তার ওপর এলিয়ে আছে ক্লান্ত তনুর কমনীয় কান্তি—ভাটায় জলস্রোত যেন জিরোচ্ছেন। চারপাশে রাশি রাশি ফুল স্তূপীকৃত হয়ে আছে–,বাতাস মন্থর হয়ে গেছে তাই কারো মুখে একটি রা নেই, সবারই মুখে নম্র বেদনা-শীতল একটি ছায়া,–সমস্ত গৃহে বিষাদপূর্ণ একটি মহাশান্তি। শিয়রের ধারে খান কয়েক বই—আত্মীয়ের মতো স্তব্ধ বেদনায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে, আর কয়েকখানি পুরোনো চিঠি। নিষ্ঠুর ডাক্তার পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে আছে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে।

শুধু পায়ের ওপর দুটি হাত রেখে একটি দুঃখী মেয়ে বোবার মতো বসে আছে—যেন বিসর্জনের প্রতিমা। মুখোনি ভারি মলিন ও উদাস, তাইতে এত সুন্দর।–মা নয়, বোন নয়, বউ নয়, যেন আর কেউ।

অমরের সেদিন মনে হয়েছিল, মৃত্যুও একটা বিলাসিতা। মেয়েটির বুকের ব্যথাটি যেন এক অমূল্য বিত্ত। এ তো মরা নয়, মিশে যাওয়া। যেমন মিশে যায় ফুলের গন্ধ বাতাসে, যেমন গলে যায় সূর্যাস্তলালিমা অন্ধকারে।

সন্ধ্যায় টানটা ফের পড়লে অমর বালিশের তলা থেকে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি বার করে ঠিকানা ঠাহর করতে চলল।

মা প্রশ্ন করলেন কোথায় যাচ্ছিস?

—পাত্রীর খোঁজে। তোমার কত দিনের ইচ্ছা। অপূর্ণ রাখা অনুচিত মনে হচ্ছে।

এক কালে অবস্থা ভালো ছিল, বাড়ির চেহারা দেখলে বুঝা যায়। এখন একেবারে গঙ্গাযাত্রী

বুড়ি।

এখনো পাত্র জোটে নি। অমরের যেন একটু আসান হল।

বহু কথা-বার্তার পর শ্যামাপদবাবু বললেন ছেলেটি কি করেন?কত চাহিদা?

—বি.এ. পড়ে। এত দিন মার গয়না বাঁধা দিয়ে চলছিল—আর চলে না। চাহিদা,—পড়া-খরচ দুবছর,—আর নগদ হাজার খানেক টাকা।

শ্যামাপদবাবু তাতেই স্বীকৃত ছিলেনা তার কারণ আছে,–দরাদরি করতে গিয়ে কেবলই দাঁও ফসকেছে। তা ছাড়া মেয়ের ইতিহাসও বড় ভালো নয় দেখতে তো নিতান্ত কুরূপাই,–এত কুৎসিত যে, ঘাটের মড়ার পর্যন্ত নাকি দাঁতকপাটি লাগে।

অমর বললে—ছেলেটির কিন্তু এক ব্যারাম আছে,–হাঁপানি প্রায়ই ভোগে।

শ্যামাপদবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লেন—এমন আর কি শক্ত ব্যায়রাম! ওতে তো আর কেউ মরে না! বয়েসকালে সেরেও যেতে পারো তা, আপনি কি ছেলের বন্ধু, মেয়ে দেখে যাবেন। একেবারে?

অমর বললে—আজ্ঞে না, আমিই পাণিপ্রার্থী,—ওটা একেবারে বিয়ের রাতে সেরে ফেললেই চলবে। দিন ঠিক করে খবর দেবেন আমাদের, ঠিকানা রইল।

শ্যামাপদবাবুর মনে অনেক প্রশ্ন ঘুলিয়ে উঠলেও কোনোটাই আমল দিলেন না। খালি মেয়ে পার করতে পারবেন,—তাও অবিশ্যি বাষট্টি বছরের বুড়োর কাছে নয়,—এই খবর গিন্নীর কানে দিতেই গিন্নী উলু দিয়ে উঠলেন। বাড়িতে সোরগোল পড়ে গেল। বাড়ির এক কোণে একটি কুৎসিত কালো মেয়ে দীপশিখার মতো কেঁপে উঠলো খানিকা

মা বললেন—জানাশোনা নেই, কেমন না কেমন মেয়ে, একেবারে কথা দিয়ে এলি?

অমর রাগ করে বললে—আর তোমার ছেলেই বা কি গুণধর মা, যে একেবারে পরী তার ডানা দুটো সগগে ফেলে রেখে ফার্স্ট ক্লাস ফিটনে চড়ে তোমার পদ্মবনে এসে দাঁড়াবেন! শাঁখ বাজাও মা। গুনে গুনে হাজারটি নগদ টাকা, আর দু বচ্ছর পড়া-খরচ।

মা অপর্যাপ্ত খুশী হয়ে গেলেন। বিয়ে হয়ে গেলে কাশী যাবেন, সঙ্কল্পও সম্ভব হল।

অমর বললে-তোমার ছেলের এই তো চেহারা—একটা আরসুলার চেয়েও অধম। তার ওপর বুকের পাঁজরায় ঘুণ ধরেছে। যা পাও, তাই হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ো।

মা বললেন—মেয়ে যদি খোঁড়া হয়?

—কি যায় আসে তাতে? তোমার ছেলে যে কুঁজো। টাকাগুলি তো চকচকে হবে।

সরোজ বললে—কবে প্রেমে পড়লে হঠাৎ? ফরদা হাওয়ায় পর্দা বেঁফাস হয়ে গেল বুঝি?

লুসী সে ঘরে বসেই সেলাইর কল চালাচ্ছিল, বললে—কবে পড়েছেন উনি পাঁজি দেখে তারিখ লিখে রেখেছেন কি না! আর জন্মে পড়েছিলেন, এ জন্মে পেলেন।

সরোজ বললে—পড়তে মন যাচ্ছিল না মোটেই, ঘুম পাচ্ছিল। লুসীকে বললাম,-কল চালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দে, দিদি। এবার থামাতে পারিস, আমি অমরের সঙ্গে বেরোচ্ছি। দে তো চাবিটা।

দুই বন্ধু বেরিয়ে গেল।

পিঠের ওপর চুল মেলা, মান্দ্রাজি মেয়েরা যেমন করে শাড়ি পরে তেমনি ধরন শাড়ি পরার, দুটি হাতে সোনার কঙ্কণ, ছুঁচে সুতো পরাবার সময় চোখের কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ললাটে আভা।

ঘুরে ঘুরে অনেক জিনিসই সওদা করলে দুজন,—বাক্স বোঝাই করে টোপর পর্যন্ত। তিনটে মুটে।

ফেরবার মুখে আরেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা বয়সে কিছু বড়।

অমরকে জিজ্ঞাসা করলে কি করছ আজকাল?

—বিয়ে করছি। চূড়ান্তা আর তুমি? টিউশানি পেলে?

—পেয়েছি একটা যৎসামান্য ঐ গলির বাঁকের লাল বাড়িটা।

—ও! কত দেয়?

—কিঞ্চিৎ ল-কলেজের মাইনে সাড়ে সাত টাকা।

সরোজ চোখ বড় করে বললে–সাড়ে সাত টাকা?

লজ্জিত না হয়েই বললে বন্ধু—হ্যাঁ, তাই সই মাইনেটা তো চলে যায় আর কি বেয়াড়া এঁচড়ে-পাকা ছেলেই পড়াতে হয়, ভাই! এইটুকুন বয়স থেকেই পদ্য মেলাতে শিখেছে। ভাগ্যিস বাপ-মার নাই' নেই এতে, নইলে উচ্ছন্নে যাবার সুড়ঙ খোঁড়া হচ্ছিল আর কি। মা বলে দিয়েছেন, ফের পদ্য মেলালে বেত মারতে তিনটে খাতা প্রায় ভরতি করে ফেলেছে, ভাই সবগুলি পুড়িয়ে ফেলেছি কাল।

অমর বললে—খুব কাঁদলে?

—বাপের চড়-চাপড়ও তো কম খায় নি মা তার হাতের নোড়া নিয়ে পর্যন্ত তেড়ে এসেছিল কবিতা লিখতে গিয়েই না ছেলেটা এবার অঙ্কে একেবারে গোল্লা পেলে!

অমরের মনে পড়ছিল, সেই খাকি রঙের শার্ট, কোমরে কাপড়ের সেই ছোট আলগা বাঁধুনিটি, —সেই তরল জ্যোৎস্নার মতো দুটি চোখ, সেই বালি-কাগজের ছেঁড়া-খোঁড়া খাতাটা, পেন্সিল দিয়ে লেখা কবিতা, নাম—'বড়দি বা বড় তারা',–এক দিন ছোট্ট কচি হাতখানি দিয়ে বুকটা আস্তে একটু ডলে দিয়েছিল—

অমর ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললে—রোজ শেষ রাত্রেই হাঁপানিটা চেগে আসে। একটা ইনজেকশান দিয়ে দিন, যাতে অন্তত আজ রাতটা রেহাই পাই। আমার বিয়ে কি না।

ডাক্তার বিস্মিত হলেন বটে। যাবার সময় অমর টেবিলের ওপর একটা নিমন্ত্রণপত্রও রেখে গেল।

বউ-ভাতে তো কাউকে খাওয়াতে পারবে না, তাই যার সঙ্গে একটি দিনের জন্যেও প্রীতি বিনিময় হয়েছিল তাকে পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করলো টাইম-অনুসারে একটা ঠিকা গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করতে কি সুখ!

রাজা।

কেন নয়? সবাইর চেয়ে উঁচু জায়গায় আসন, সামিয়ানা খাটানো, তাতে তিনটে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে, ফুলদানিতে বিস্তর ফুল, গলায় প্রকাণ্ড মালা, গায়ে সিল্কের দামী জামা, জীবনে

এই প্রথম পরেছে, পায়ে চৌদ্দ টাকা দামের জুতো,—দু-মাস টিউশানি করে যা জোটে নি।

ছেলেরা চেঁচামেচি করছে, মেয়েরা প্রজাপতির মতো উড়ছে ও বর্ষার জলধারার মতো কলরব করছে। বন্ধুরা এসে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে যাচ্ছে। চিকের পেছনে বর্ষীয়সী মেয়েদের ভিড় লেগে গেছে—উলু দিয়ে দিয়ে গলা ভেঙে ফেলছে। উলু দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বরটা বিকৃত হয়ে গেল, দেখে একটি মেয়ের স্রোতের মতে কি স্বচ্ছ হাসি!

এ বাড়িতে আজ যেখানে যা হচ্ছে সবই তো অমরের জন্য খাবার নিয়ে আঁস্তাকুড়েতে কুকুরগুলি যে লড়াই বাধিয়েছে, তাও। যা কিছু বাজনা, যা কিছু হাসি, যা কিছু কোলাহল!

ঐ যে নিভৃতে দাঁড়িয়ে একটি কিশোরী দুটি হাত তুলে চুলের খোঁপাটা ঠিক করে গুছিয়ে নিচ্ছে, চুলের কাঁটাগুলি ফের ভালো করে গুঁজে দিচ্ছে সেও তো তারই জন্য!—অমর ভাবছিল। নইলে আজ মেয়েটি কখনো এই নীল শাড়ীটি পরত না, মাথায় কখনো খুঁজত না ঐ শ্বেতপদ্মের কুঁড়ি

শুভদৃষ্টির সময় সবাই বললে বটে, কিন্তু অমর ঘাড় গুঁজে রইল, মুখ তুলে চাইল না। পাছে ভুল ভেঙে যায়। খালি একটি কথাই মনে পড়ছিল তখন

লুসী জিজ্ঞাসা করেছিল—কি নাম আপনার বউয়ের?

অমর বলেছিল—মনোরমা।

লুসী খপ করে বলে ফেলেছিল—ওমা! আমারও ভালো নাম যে তাই বলেই রাঙা হয়ে উঠে মুচকে হেসেছিল একটু।

পাছে তেমনি রাঙা হয়ে উঠতে না পারে। পাছে—

মনোরমা নিজে কুৎসিত হলেও আশা করেছিল ছবির পাতায় রাজপুত্রের যে ছবি দেখেছিল, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া না হলেও তেমনিই সুকান্ত হবে তার প্রিয়তম। ভাবলে—কড়ে আঙুল দিয়ে কপালে এক টোকা মারলেই ঘাড় গুঁজে পড়ে যাবে বুঝি

তবুও তো স্বামী ডাক্তার এসে আর দড়ি দিয়ে কপাল বেঁধে দেয় না, সারারাত্রি মনোরমাই কপাল টিপে দেয়। কখনো অনাবশ্যক বলপ্রয়োগ করে বসে রাগ করেই হয়তো।

অমর সবচেয়ে ঘৃণা করত নিজের এই কদর্য ব্যাধিটাকে। আর ঘৃণা করে, যে মুখটা তার সত্যিই বত্রিশটা দাঁত আছে কি না অন্যকে গুনে দেখাবার জন্য সর্বদাই মেলে রয়েছে, সেই মুখটাকে। মনোরমা নাম বদলে নাম রেখেছে তিলোত্তমা!

মা কেঁদেছিলেন বটে একটু, এক ফাঁকে এক এক করে নোটগুলি গুনেও নিয়েছিলেন বার চারেক।

হঠাৎ একদিন কয়েকখানি আঁচলের খুঁটে বেঁধে কাশী চলে গেলেন। বলে গেলেন বউ তো হয়েছে। বেঁধেও দেবে, বুকে মালিশও করবো আমি দিন কতক ধর্ম করে আসি, জিরিয়েও আসি।

শ্যামাপদবাবু এসে মেয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন অমর আপত্তি করলে না। বললে—এ কদিন হয় কোনো একটা মেসেই থাকব। কারো হাত বুলিয়ে না দিলেও চলবে। তবে শিগগিরই যেন আসো

বাড়ি ফিরে এসে শ্যামাপদবাবু মনে মনে বলছিলেন বাবা, কাঁটাটা তো খসেছে গলা থেকে! বন্ধুদের বললেন—দুমণ বস্তাও পিঠে করে বওয়া যায় কিন্তু এই কুৎসিত মেয়েটা কি হয়রানি করেই মেরেছিল! তবু যদি—

তারপরের ব্যাপারটা একটু আকস্মিক বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সন্ধ্যার দিকে রাস্তাতেই খুব জাঁক করে হাঁপানি উঠে গেল। একটা গাড়ি ঠিক করতে রাস্তার মধ্যে আসতেই বেহুশের মতো একটা মোটর অতি আচমকা একেবারে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল কাঁধের ওপর। তার পর ঘষড়াতে ঘষড়াতে—

শ্যামাপদবাবুর কাছে খবর গেল। মনোরমা একবার যেতেও চাইল কেঁদো বাপ বুঝিয়ে বললেন—এখন গিয়ে কি আর এগোবে বল? গঙ্গায় না হোক কলতলাতেই শাঁখা ভাঙলে চলবে। পানটা আর চিবোস নি, মা।

মার কাছে তার পৌঁছল না। ঠিকানা বদল করেছেন।

আরো একবার রাজা। সবাইর কাঁধের ওপর। ওর জন্যই তো আজকের সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ওর জন্যই তো লুসীর চোখে একবিন্দু অশ্রু!